উপসংহার

'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে' শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সর্পদেবী মনসা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা আবশ্যক। আদিকালে মানুষের জ্ঞান হওয়ার আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, মনের মধ্যে ভক্তিভাব নিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। আর এই সূত্রেই উৎপত্তি হয় দেবতা-ভক্ত ইত্যাদি শব্দগুলি। দেববাদের সৃষ্টি এইভাবেই ঘটেছে অনুমান করা যায়। লোকসমাজে সর্পকে কেন্দ্র করে সর্পদেবীর ভাবনাও এভাবে এসেছে। সেই সঙ্গে সর্পদেবীকে কেন্দ্র করে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কাল্পনিক গল্প প্রচলিত হতে থাকে। বিশেষ করে নারী সমাজে এই পাঁচালী, ব্রতকথা আধিপত্য বিস্তার করে। আমাদের বাংলাতে সর্পদেবী মনসার পূজার প্রচলন হয় একই ভাবে। বাংলার মানুষের ঘরের দেবীতে পরিণত হয়। তুর্কী আক্রমণের পরে আনুমানিক পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলার এই লৌকিক দেবীকে কেন্দ্র করে কাব্যের আকারে আখ্যান রচিত হতে থাকে, যাকে মনসামঙ্গল বলা হয়ে থাকে। দেবী মনসার মঙ্গলগান গেয়ে পুজো দিলে সর্প দংশন থেকে নিস্তার পাবে মানুষ। যার ফলে এই মনসামঙ্গল সাধারণ সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আবার লৌকিক দেবী মনসাকে শিবের কন্যারূপে দেখানো হয়েছে। দেবসমাজে এই দেবী স্থান না পেলেও তিনি যে দেবতারই অংশ তা মনসামঙ্গলে দেখানো হয়েছে। আর্য ও প্রাগার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে।

মনসাদেবীকে কেন্দ্র করে সুবৃহৎ এই আখ্যানকাব্যের পরিচয় ও চাঁদ সদাগর-বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীকে তুলে ধরার জন্য বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসাবিজয়', বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ', নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ' ও জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পশ্চিমবঙ্গের কবি বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসাবিজয়ে' মনসা পূজা দিতে চাঁদ সদাগর আপত্তি করলেও মনসা যে শিবেরই আত্মজা, সেকথা শুনে চাঁদ নিজেকে অপরাধী মনে করে ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং শেষে মহাসমারোহে পূজা দেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গের কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যেও মনসার জয় ঘোষণা করতে গিয়ে চাঁদকে অনেক বেশি হেনস্থা হতে দেখা যায়। মনসাদেবীর দেবমাহাত্ম্যের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে চম্পকনগরের অধিপতি চাঁদ সদাগর দেবীর পুজো দেয়। দেবতাদের প্রাধান্যের কারণেই মনসা ও চণ্ডী একাকার হয়ে উঠেছেন অনেক সময় । তবে সপ্তদশ শতকে দেবতার থেকে মানবতার প্রাধান্য শুরু হওয়ার কারণে উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গলে' চাঁদের পূজা পাওয়ার জন্য মনসার দৈবিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখা

যায় না। শেষ পর্যন্ত মনসা পূজা দিলেও অনেক দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছে চাঁদ। গতানুগতিক কাহিনীকে নিয়ে জগজ্জীবন মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করলেও যুগভাবনাকে অস্বীকার করতে পারেননি। সরাসরি নরনারীর প্রেম নিয়ে আরাকান রাজসভার কবিগণ— দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল যেখানে কাব্য রচনা করেছেন, সমসাময়িক জগজ্জীবনের কাব্যেও তার প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক।

মূলত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপে মনসাকথার প্রভাবের ফলে এক নতুন সাহিত্যধারা সৃষ্টি হয়। লোকসাধারণের দেবীকে নিয়ে কবিগণ মধ্যযুগে আখ্যান কাব্য রচনা করেছিলেন, আধুনিক ও উত্তরআধুনিক যুগে এই মনসাকথা নতুন ভাবে উঠে এসেছে আমাদের কাছে। চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখীন্দর ও সনকা চরিত্রগুলিরও ঘটেছে বিনির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও নবনির্মাণ। আধুনিক যুগের কঠিনতম সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়, মনুষ্যত্বের ক্ষয়ের ফলে অবলুপ্তি ঘটেছে মানবতার, মানুষের চিন্তা-চেতনার, বুদ্ধির, আনন্দের। এই সংকটময় প্রেক্ষাপটে মানুষের মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য উজ্জ্বল অতীতকে আশ্রয় করেছেন কবি-সাহিত্যিকগণ। এভাবেই দেবী মনসার মাহাত্ম্য, চাঁদ সদাগরের ঔদার্য, বেহুলার কল্যাণময়ী রূপ আমাদের সামনে উঠে এসেছে বিশ শতক থেকে আজকের একুশ শতকেও।

মনসামঙ্গলের বেহুলার সতীত্ব, পাতিব্রাত্য, আদর্শের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে ও লৌকিক দেবীর এই কাব্যকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন লেখেন 'বেহুলা' রচনাটি। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে তৎকালীন বাংলার নারীদের মধ্যে যে পরিবর্তন, তার ফলে সাত শত বছর ধরে বাংলার নারী সমাজের আরাধ্যের পূজারী বেহুলার প্রতি অবহেলার ভাব না আসে, তাই আশা করেছেন লেখক। রচনাটির শেষে, বেহুলার সতীত্ব সম্পর্কে সমাজ থেকে প্রশ্ন উঠলে সে নিজেই সতীত্বের পরীক্ষা দেয় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নারীর সম্মান রক্ষায় প্রয়াসী হয়।

প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী মন্মথ রায় মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন। এই নাট্যসংলাপের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব মুখরিত হয়েছে মনসা ও চাঁদ সদাগরের মধ্যে। মনসা কখনো ভ্রাতৃসম্বোধন করেছেন চাঁদকে, আবার কখনো প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। শেষে দেবী মনসা ও দেবাদিদেব মহাদেব একে অপরের পরিপূরক বলে চিহ্নিত হয়েছেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগরের নৌকা'তে বৃদ্ধ প্রসন্ন শেষ পর্যন্ত নিজের ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখতে পারেনি। পরিবার ও সমাজের যূপকাষ্ঠে বলী হয়ে ধূলোয় মিশেছে তার পূর্ব জীবনের ঐশ্বর্য। তাই নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য বিদূষক চরিত্রের অভিনয়ের দিকে পা বাড়ায়। অন্যদিকে শম্ভু মিত্র 'চাঁদ বণিকের পালা'তে মনসাকে বিশ শতকের শেষার্ধের কুটিল সমাজ, স্বার্থান্বেষী, অসৎ সময়ের

প্রতিভূ রূপে দাঁড় করিয়েছেন। চাঁদ সদাগর হয়ে উঠেছেন সত্যের পূজারী, আলোর পূজারী। বরাক উপত্যকার অন্যতম নাট্যকার খানিকটা মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগরে'র মতো মনসাদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক আখ্যান কাব্যের নট্যরূপ উপস্থাপন করেছেন একুশ শতকের প্রারম্ভে 'মনসা কথা' নাটকে। পঞ্চদশ শতকের ক্রূর, সংগ্রামী মনসাদেবী একুশ শতকে এসে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। বাহুবলের দ্বারা যে কোন শুভ কাজ হয় না, তাঁর মানসিকতায় সেটি ধরা পড়েছে। ধৈর্য্যশক্তি, বুদ্ধি ও চিন্তাচেতনার দ্বারা যে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, মনসা তাই দরিদ্র মাঝিমাল্লাদের চাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগে উত্তেজিত না হয়ে তাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তবে অন্যায়কে কোনভাবেই প্রশয় দিতে নারাজ তিনি। এইভাবে শেখর দেবরায় উত্তর আধুনিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। মনসা ও চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্ব, তৎসঙ্গে বেহুলা-লখীন্দরের আধুনিকীকরণ তা আলোচিত নাটকগুলির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। চরিত্রগুলি মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের হলেও নাট্যকারের হাতে তারা হয়ে উঠেছে একেবারে আধুনিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। নাট্যকার শম্ভু মিত্রের চাঁদ চরিত্র যেমন সত্যের পথে পাড়ি দিয়ে বিফল হয়েও সত্যকে জীবনের চলার পাথেয় করে রাখে, তেমনি লখীন্দর চরিত্র তাঁর নিজস্ব আইডেনটিটি খোঁজার ব্যাকুলতায় কোথায় যেন বিপন্নতা বোধ করে। মধ্যযুগের বেহুলা যেমন সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েও স্বামীকে ফিরিয়ে এনে স্বামী বা সমাজের কাছে নিজের সতীত্বের পরিচয় রাখতে পারে না, তেমনি এই বেহুলা আধুনিক যুগেও শিকার হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জালে। মধ্যযুগের বাতাবরণকে বজায় রেখে আধুনিক মনস্তত্বের আলোকে চরিত্রগুলো বর্তমানকালের জীবন জটিলতার চূড়ান্ত মাত্রায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সমকালীন বাস্তবতা ও চাহিদার নিরিখে আধুনিক কবিদের হাতেও মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাহিনী ও চরিত্রগুলি যুগাতিক্রমী হয়ে উঠেছে। কবিদের অকৃত্রিম সহৃদয়তায়, পর্যবেক্ষণ শক্তি, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টিতে উঠে এসেছে আধুনিক যুগের মূল সত্য, মানুষের চরিত্র, ও মানব রস। কবিদের হাতে উঠে এসেছে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনামাখা বাস্তব মানুষ। কবি কালিদাস রায় তাই একদিকে যেমন মানবতাবাদের পূজারী করে তুলেছেন চাঁদসদাগরকে, তেমনি 'বেহুলা' কবিতায় বেহুলাকে ক্রমশ এক সময়জয়ী নারীতে সম্প্রসারিত করেছেন। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য বঙ্গদেশের জনজীবনে প্রায় মিথ হয়ে ওঠা বেহুলাকে রূপান্তরিত করেছেন এক বিপ্লবী নারীতে। তাঁর কবিতায় মৃত প্রাণ প্রেমিকটি সাময়িক ও শাশ্বতের দ্বন্দ্বে আদৌ বাঁচবে কিনা তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে এই বেহুলারূপী নারীর উপরেই। এইভাবে মধ্যযুগের বেহুলাকে কাব্যভূমির বাস্তবে স্থাপন করেছেন কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য

দীপঙ্কর মাহমুদের কবিতায় বেহুলার ভেলাও হয়ে উঠেছে সংগ্রামের হাতিয়ার। আধুনিক সংগ্রাম মুখর, রাজনৈতিক অস্থিরতাময় যুগে কবি শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামী, কৃষ্ণা বসুর কবিতায় মধ্যযুগের চাঁদ সদাগরের হেতালের লাঠি ও চৌদ্দডিঙা মধুকর মানবিক রূপ লাভ করেছে। আবার আসাম প্রদেশের বরাক উপত্যকার কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর 'মনসা-মঙ্গল' কবিতায় উঠে এসেছে নদী কেন্দ্রীক গ্রামবাংলার ঘরের ছবি। সেই সঙ্গে কবি উত্তম দাশের 'এ কালের মঙ্গলকাব্য' কাব্যগ্রন্থের মনসামঙ্গলকে প্রেক্ষাপট করে রচিত কবিতাগুলিতে উঠে এসেছে জীবনানন্দ দাশের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতার মতো বাংলার নদী-মাঠ-ঘাট, ভাটফুল ও ঘুঙুরের শব্দ। অন্য দিকে নারীর অধিকারবোধ, আত্মচেতনা উঠে এসেছে জিয়া হায়দারের কবিতায়।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় চাঁদ সদাগরকে কেন্দ্র করে রচিত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' রচনাটিতে নায়ক চাঁদ শোষক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি আজু মৃধার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় সে নিজ অধিকার। সে বাম হাতে পূজা বা আপোষের পক্ষপাতী নয়, তাই ধড় থেকে আলাদা করে দেয় আজু মৃধার মুণ্ডু।

লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা ও অশুভ শক্তির প্রকোপে পড়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার চিত্র বর্ণিত। তবে প্রাচীন পল্লব-চোল রাজত্বকালের আবহ রয়েছে উপন্যাস জুড়ে। শেষে চাঁদের মৃত্যুকে জয় করে নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্য দিয়ে আশার আলো পাওয়া গেলেও সেলিনা হোসেনের নির্মিত চাঁদের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি এই চাঁদ। অন্যদিকে 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' উপন্যাসের রমানাথ বাবুকে অনেকটা অসহায় করে ফেলেছেন লেখক সত্যপ্রিয় ঘোষ। ভাগ্যের পরিহাসে সে একজন পরাজিত ব্যক্তি, নিজেকে সে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছেন। বিশ শতকের শেষের দশকেই কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন মনসামঙ্গলের লখীন্দরকে নিয়ে রচিত করেছেন 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাস। তবে লখীন্দর বিদ্যাধরীর সঙ্গে প্রেমে মত্ত হয়ে, নিজেকে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্থ হলে শেষপর্যন্ত এক সার্থক পুরুষ হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনে সে সমাজ-পরিবার ছাড়তেও পিছুপা হয়নি। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত আধুনিক এই উপন্যাসগুলিতে মনসা-কথার নবনির্মাণ তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ের আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা-কথার নবনির্মাণে প্রত্যেকটি ছোটগল্পই বেহুলাকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা' রচনাটি যে গ্রামকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে সেটির নাম বেহুলা, গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর নামও বেহুলা। প্রত্যন্ত গ্রামের লোকদের

মধ্যে এই বেহুলার মিথ এমনভাবে মিশে রয়েছে যে তারা নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে কাল্পনিক গল্পও নির্মাণ করেছে। চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ দেবসভায় নির্লজ্জ লাস্যনৃত্যের জন্য অভিশাপগ্রস্থ হয়ে সর্পদংশিত মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যায় সারাজীবন। এর সমাপ্তি কবে কেউ জানে না। তবে সাপের আড়তে আগুন লাগিয়ে অভিশাপ নিবারণের চেষ্টা করে গ্রামের দারিদ্র মানুষেরা। এখানেই গল্পটির সার্থকতা ও অভিনবত্ব। বিমল করের 'বেহুলা'তে আবার দেখা যায় বেহুলা নামের ছোট একটি মেয়েকে। পিতা-মাতা হীন এই মেয়েটি লোকের বাড়িতে কাজ করে বেঁচে থাকে। অসহায় এই মেয়েটি মনসাপুরাণের বেহুলার মতো সাহসী না হলেও একসময় নিজের সন্তানদের দ্বারা প্রতারিত বৃদ্ধ ঠাকুরদা ও স্ত্রী ইন্দুমতীর আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। তাই বৃদ্ধ ঠাকুরদা ভাবেন এখনো তাদের বসার জায়গা আছে। 'সতত বেহুলা'তেও লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় বেহুলাকে নির্মাণ করেছেন আরেক দৃষ্টিভঙ্গিতে। রিটায়ারের পরে পনেরোটি বছর কেটে গেছে, তবুও শান্তিনাথ একাকিত্বের জীবন কাটায়। স্ত্রী, পুত্র-পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিদের নিয়ে ভরাট সংসারেও সে বিচ্ছিন্ন। টুকিটাকি কাজ নিয়ে এলোমেলোভাবে সারাদিন কাটিয়ে রাত্রের অন্ধকারে তার একমাত্র আশ্রয় হয় পুরনো টিভি চ্যানেল। বেহুলার ভেলাতেই সে ভেসে যেতে চায় আনন্দময় জীবনের আশায়। মনসাপুরাণের বেহুলা যেমন লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে এনেছিল নিজের সততার উপর নির্ভর করে, শ্বশুরের চৌদ্দডিঙা ফিরিয়ে এনে শেষে মনসার সঙ্গে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন। শান্তিনাথের তাই বেহুলা ও তার ভেলাতেই ভরসা। এইভাবে বেহুলা চরিত্রের অভিনব ব্যঞ্জনা উঠে এসেছে ছোটগল্পগুলিতে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত আটটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণের আলোচনায় আমরা যে আধুনিক রচনাগুলি পেয়ে থাকি, সেগুলির প্রায় সবগুলিতেই দেবী মনসার চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে চাঁদ সগাদর, বেহুলা, লখীন্দর ও সনকা চরিত্রগুলি। আসলে যুগের পরিবর্তনের ফলে দেবী মনসাও আধুনিক নারীতে পরিণত হয়ে দৈবী মহিমার বদলে মানবতাবাদের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখীন্দর ও সনকাকে নিয়ে গদ্য আখ্যান, নাটক, কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার প্রবণতা বেশি দেখা দিয়েছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে কবি-সাহিত্যিকগণ আহ্বান করেছেন অতীতের এই ঐতিহ্যশালী চরিত্রগুলি। যারা তৎকালীন দোলাচলতার যুগে আদর্শ চরিত্র রূপে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করবে। এইভাবে কবি সাহিত্যিকের নিজস্ব ভাবনায়, আলাদা আলাদা প্রকরণে চরিত্রগুলি নতুন রূপে উঠে এসেছে। তাই বলা যায় মধ্যযুগের মনসামঙ্গলগুলিতে চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখীন্দর, সনকা ইত্যাদি চরিত্রগুলি নিয়ে যে মনসার কাহিনী, তা আধুনিক সাহিত্য সংরূপে নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। অর্থাৎ নবনির্মাণ

ঘটেছে। অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমান গঠিত হয় না, আবার বর্তমানের উপরেই নির্ভর করে ভবিষ্যতের ঔজ্জ্বলতা, বর্ণময়তা ও সার্থকতা। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপে যেমন মনসা-কথার নবনির্মাণ ঘটেছে, তেমনি লিখিত এই সাহিত্যগুলির পথ ধরেই পরবর্তী কবি-সাহিত্যিক আরো অভিনব শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিবেন, এই শুভাকাঙ্ক্ষা আমরা নিঃসন্দেহে মনের গোচরে পোষণ করতে পারি।

*****